সামাজিক রূপ

পঞ্চম অধ্যায়

সামাজিক রূপ

ক) পরিবার গঠন :—

জৈবিক প্রয়োজনে এবং নিরাপত্তার সুবিধার জন্য মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে । দাম্পত্য জীবনের পরিণত ফল হ'ল পরিবার । চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষ যাযাবর নয় । এরা সমাজবদ্ধভাবে বাস করে । খুব সহজ সরল এদের জীবন যাপন । একান্নবর্তী পরিবারই এদের সর্বাধিক পছন্দ । পরিবারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কৃষিকাজ করা সুবিধাজনক , তাই এরা যৌথ জীবন পছন্দ করে । প্রতি পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠরাই কর্তৃত্ব করেন । তাঁদের নামেই পরিবারের পরিচিতি নির্ধারিত হয় ।

এদের মাঝে ধনী নির্ধন সমস্ত পরিবারেই প্রাচীন কালে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল । সাম্প্রতিক কালেও অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বাল্য বিবাহ বিদ্যমান রয়েছে । অবশ্য "মধ্যযুগে অন্ততঃ বাংলাদেশে বাল্য বিবাহ প্রথা কঠোরভাবে প্রতিপালিত হইত । এ যুগের প্রধান স্মার্ত পন্ডিত রঘুনন্দন ষোড়শ শতাব্দীর লোক । তাঁহার ব্যবস্থাই বঙ্গদেশে বেদ বাক্যের ন্যায় গৃহীত হইত । তিনি উদ্বাহ তত্ত্বে লিখিয়াছেন :' কন্যার রজোদর্শন হইবার পূর্বেই কন্যাদান প্রশস্ত । ৮ বৎসরের কন্যাকে গৌরী বলে, ৯ বৎসরের কন্যা রোহিনী, ১০ বৎসরের কন্যারা এবং ইহার পর রজঃস্বলা হয় । অতএব দশ বৎসরের মধ্যে যত্ন সহকারে কন্যাকে প্রদান করা কর্তব্য । ..... যে কন্যা ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত অপ্রদত্তা হইয়া পিতৃগৃহে বাস করে তাহার পিতা ব্রহ্মহত্যা পাপের ভাগী হয় ; এরূপ স্থলে ঐ কন্যার স্বয়ংবর অন্বেষণ করিয়া বিবাহ করা উচিত ।' অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যে রঘুনন্দনের বিধি অনুসারে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে । অবশ্য রঘুনন্দন প্রাচীন শাস্ত্রকারদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই বিধি দিয়াছিলেন কিন্ত মধ্য যুগের অন্ধ সংস্কার এই মতটিকে ধর্মের অঙ্গরূপে গণ্য করিয়া বিনা বিচারে ইহা পালন করিত এবং গৌরীদান করিয়া ঐ কন্যার গর্ভজাত সন্তানের পিতৃকুলে একুশ পুরুষ এবং মাতৃকুলে ছয় পুরুষের অক্ষয় স্বর্গবাসের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিত ।"[১]

চাঁই সমাজে গৌরীদান প্রথা কোন কালেই প্রচলিত ছিল না । এরা কন্যার ৭ বৎসর বয়সেই তাকে পাত্রস্থ করার প্রশস্ত কাল ব'লে মনে করত । এই সমাজে তৎকালে

এতদ্অঞ্চলে যে প্রবাদ বাক্যটি প্রচলিত ছিল তা হচ্ছে , —

'সাত্‌য়্যা সোনা, আট্‌য়্যা রূপ ;
ন্যাউয়্যা দ্‌লাহা বোলাকে আন্‌ ।'

অর্থাৎ , নয় বৎসর বয়সে কন্যা অরক্ষণীয়া ব'লে বিবেচিত হ'ত ; এবং যেন তেন প্রকারেণ তাকে পাত্রস্থ করা হ'ত । মধ্য যুগীয় অন্ধ কুসংস্কার তাদের মনে এরূপ ধারনা বদ্ধমূল করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই । কেবল এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই নয় , পঞ্চদশ শতাব্দীতে কুমারী কন্যার ৭ বৎসর বয়সেই পাত্রস্থ করার রীতি ছিল । এর সমর্থন মেলে মাণিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলে ।

"সাত বৎসরের হৈলে হুত হয় নারী ।
দশ বৎসর হৈলে পূর্ণ - কুমারী ॥
এগার বৎসর হৈলে চঞ্চল হয়ে চিত ।
বার বৎসর হৈলে পুষ্প বিকশিত ॥
তোমার খুলুনা হৈল সপ্ত বৎসরে ।
এহি সময় বিবাহ দেহ ধনপতির তরে ॥"[২]

রম্ভাবতীকে উদ্দেশ্য করে পন্ডিত জনার্দনের এই উক্তির মধ্য দিয়েই তৎকালীন হিন্দু সমাজের প্রচলিত বিবাহ রীতির চিত্রটি উদ্ভাসিত হয় ।

বিধবা বিবাহের প্রচলন সাম্প্রতিক কালের ঘটনা নয় ।" সতী প্রথা রহিত হওয়ায় এবং ব্রাহ্ম সমাজে বিধবা - বিবাহ প্রচলিত হওয়ায় হিন্দু সমাজেও বিধবা - বিবাহ প্রবর্তনের সপক্ষে আন্দোলন আরম্ভ হয় । .... অবশেষে বহু আন্দোলন ও তর্ক বিতর্কের পর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হইল । কিন্তু এই আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও বিধবাবিবাহ সমাজে খুব প্রসার লাভ করে নাই ।"[৩] কিন্তু চাঁই সমাজে বাল্য-বিবাহের সঙ্গে বিধবা - বিবাহও এই সময় থেকে সমহারে প্রচলিত ছিল । এ প্রসঙ্গে মাননীয় G.E. Lambourn বলেছেন , " **They are agriculturists and labourers and practise widow remarriage."** [৪]

এই বিধবা-বিবাহ অনেক ক্ষেত্রে একই পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত । এই সকল ক্ষেত্রে বয়সের অসঙ্গতি থাকলেও তাকে অন্তরায় ব'লে মনে করা হ'ত না । ফলে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীর বয়স হ'ত বেশী । অবিবাহিত দেবরের সঙ্গে বিধবা বৌদির বিবাহে কোন বাধা ছিল না । বরং এই সমাজে এই অনুষ্ঠান অধিকতর সঙ্গত ব'লে মনে করত ।

" Widow marriage allowed, that to husband's younger brother being proper."[৫] পুরুষদের বহু বিবাহ খুব নিন্দনীয় ছিল না ।

চাঁই সম্প্রদায়ের নারীদের বৈধব্য জীবন খুব দুর্বিসহ ছিল বলা চলে না । "প্রাচীন বাংলায় বৈধব্যজীবন নারীজীবনের চরম অভিশাপ বলিয়া বিবেচিত হইত । প্রথমেই মুছিয়া যাইত সীমন্তের সিঁদুর , এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত প্রসাধন – অলংকার । .... প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ গ্রন্থ মতে বিধবাদের মৎস্য , মাংস প্রভৃতি যে কোনরূপ উত্তেজক পদার্থ ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল ; বৃহদ্ধর্ম পুরাণের বিধানও তাহাই । বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বিধবাদের উপস্থিতি অমঙ্গল সূচক বলিয়া তখনও পরিগণিত হইত এবং তাঁহারা সাধারণত উৎসব ও অন্যান্য মঙ্গলানুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিতেন না ।"[৬] কিন্তু চাঁই সম্প্রদায়ের বিধবাদের জীবনে এত বিধি নিষেধের শৃঙ্খল ছিল না , সাম্প্রতিক কালেও নাই । এই সমাজের বিধবারা সীমন্তের সিঁদুর এবং প্রসাধন ও অলংকারের প্রাচুর্য হারালেও আমিষ ভক্ষণ এদের কাছে আদৌ নিষিদ্ধ নয় । এরা নক্সিপাড় শাড়ী এবং সাধারণ অলংকারও ব্যবহার করে । যেকোন উৎসব এবং মঙ্গলানুষ্ঠানে যোগদানও এদের কাছে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নয় ।

এই সমাজের সামাজিক সম্প্রীতি লক্ষ্য করার মত । এদের প্রায় প্রতি সচ্ছল পরিবারেই থাকে একটি "বৈঠক ঘর" । সমাজপতির বৈঠক খানায় প্রায় দিনই সন্ধ্যাকালে পাড়ার বিভিন্ন সমস্যা, সামাজিক অসুবিধা, অর্থনৈতিক আলোচনা ইত্যাদি স্থান পায় । মাঝে মধ্যে গান বাজনা, রামায়ণ পাঠ, ধর্ম আলোচনাও চলে । এই সমস্ত বৈঠকী আলোচনায় নারীদের যোগদানের অধিকার থাকে না । সমগ্র বৈশাখ মাস এদের মাঝে যেমন নগর সংকীর্তনের প্রবণতা দৃষ্ট হয়, তদ্রুপ সমগ্র ফাল্গুণ মাস চলে হোলী গানের জোয়ার । হোলী-গানের আসরে এদের তাড়ি না হলে চলে না । এই সমাজে মদ, তাড়ী ইত্যাদি মাদক দ্রব্য খুব সমাদর পায় । নারী ঘটিত অপরাধের সংখ্যাও নগণ্য নয় । তবে এদের মাঝে সমাজ সংস্কারক ব্যবস্থাও অপ্রতুল নয় । এ বিষয়ে মুখ্য হাতিয়ার "বাইশী" বিচার জন্য ব্যবস্থা ; — যা ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি । এই সংস্কারক ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই এককালে সমাজে "ছোট চাঁই" এবং বড়x "বড় চাঁই" দুটি পর্যায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, তা আবার একই পদ্ধতিতে বিগত ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে বিলোপও করা হয়েছে । "১৩৩৭ সালে তাঁরা

চাঁই বৈশ্য সম্মেলন নামে সামাজিক সম্মেলন .... করে ছিলেন। উদ্দেশ্য – চাঁই সমাজের মধ্যে শ্রেণীভেদ তুলে দেওয়া।"[৭] এই সম্মেলনের পর থেকে এবং আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে এই সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ - অনেক প্রাচীন অন্ধসংস্কারকে সমাজের বুক থেকে অপসারিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আলো আঁধারীর ভূখণ্ডলে চাঁই সমাজের পারিবারিক জীবন একাধারে দোষেগুণে সমাচ্ছন্ন হয়েও অপরাপর সমাজ থেকে অনেকাংশে স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে।

—0—

খ) লোক সংখ্যা :——

পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সম্প্রদায়ের সাম্প্রতিক কালের লোক সংখ্যা নিরূপণ করা দুরূহ। কারণ, এরূপ কোন আদর্শ সমীক্ষাই অদ্যাবধি সংঘটিত হয়নি। 'পশ্চিমবঙ্গ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতি'র মুখ পত্র 'পরিচয়' এ এই জন সংখ্যার কিছু উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রীতুলসী চরণ মন্ডল উক্ত পরিচয় পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের দুমকা, সাঁওতাল পরগণা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার চাঁইদের সংখ্যা" প্রায় পঞ্চাশ লাখ"[৮] ব'লে উল্লেখ করেছেন। আবার শ্রী পঙ্কজ কুমার মন্ডল (উক্ত সংস্থার সভাপতি) বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, নদীয়া, বিহারের দুমকা, সাঁওতাল পরগণা জেলায় বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ চাঁই সম্প্রদায়ের লোক বাস করেন।"[৯] মোটামুটি ভাবে বলা চলে উভয়ে একই কথা এবং তথ্যের রোমন্থন করেছেন। কিন্তু এই সংখ্যা আদৌ যথার্থ নয়; সমস্তই অনুমানিক হিসাবের ভিত্তিতে গ্রথিত। কারণ তাঁদের সম্মুখে কোন প্রামাণ্য সূত্র নেই। শ্রী তুলসী চরণ মন্ডল আবার তাঁর পূর্বোক্ত বক্তব্যকে পরিবর্তন ক'রে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই পঞ্চাশ লক্ষ চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষের উল্লেখ করেছেন। "সারা পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাশ লক্ষ চাঁইদের নিজস্ব সমস্যা কি আছে তা কি দিল্লীর লোকে ভাববে?"[১০] তিনি চাঁই সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও শিক্ষিত ব্যক্তির জীবিকার পরিসংখ্যান দিতে গিয়ে বলেছেন, "পঞ্চাশ লাখ চাঁই এর মধ্যে কম করে ৫০০ জন শিক্ষিত প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক, ১০০ জন হাই স্কুলের শিক্ষক, ১০০ জন নানা পদের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী আছেন। তাছাড়া ১০ জন উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আছেন।"[১১] অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর উক্ত পরিসংখ্যানকে বিচার করেও বলা চলে এগুলি আদৌ যথার্থ এবং সমর্থন যোগ্য নয়। তিনি সাংগঠনিক বুনিয়াদ শক্ত করতে ও সরকারী দাবী দাওয়া আদায় করতে এমন একটি মনগড়া পরিসংখ্যান উপস্থাপিত করেছেন বলা চলে। কারণ, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, একমাত্র মালদহ জেলাতেই অনুরূপ শিক্ষিত ও বৃত্তিধারী চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষের অভাব হবে না।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের **Census Report** - কে ভিত্তি ক'রে মাননীয় **W. W. Hunter** তাঁর **A Statistical Account of Bengal** - গ্রন্থ সমূহে চাঁই সম্প্রদায়ের একটি প্রামাণ্য তথ্য দিয়েছেন। তা থেকে শতাধিক বর্ষ পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা জানা যায়। এই সংখ্যা যে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের তার সমর্থনে

তিনি বলেছেন ,—" The numbers, wherever possible, have been taken from the Census Report of 1872." [১২] এক্ষণে উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সম্প্রদায়ের জেলাভিত্তিক তৎকালীন লোক সংখ্যার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হ'ল । —

জেলার নাম	আলোচ্য গ্রন্থের ভলিউম নম্বর	পৃষ্ঠা সংখ্যা	লোক সংখ্যা
দার্জিলিং	Vol. No. X	৮১ – ৮৪	—
জলপাই গুড়ি	Vol. No. X	২৫৬ – ২৫১	—
কুচবিহার	Vol. No. X	৩৪২ – ৩৪৬	—
দিনাজপুর	Vol. No. VII	৩৮১	৩০৭
মালদহ	Vol.No. VII	৪২	৩০,০৮২
মুর্শিদাবাদ	Vol.No. IX	৫৬	২৬,১০০
বীরভূম	Vol.No. IV	৩৩৩	২
নদীয়া	Vol. No. II	৪১	৬৫৫
বর্ধমান	Vol.No. IV	৫৪	৩৩
হুগলী ও হাওড়া	Vol. No. III	২১০	২১
২৪ পরগণা	Vol.No. I	৭০	৮
বাঁকুড়া	Vol. No. IV	২২১ – ২২৮	—
	-------	--------	--------
মেদিনীপুর	Vol.No. III	৫৭	৫০১
		মোট লোকসংখ্যা -	৫৭৮০২

আমরা দেখলাম ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের Census অনুযায়ী সমগ্র বাংলার চাঁই সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৫৭৮০২ জন। আবার Backward Class Commission-এর Chairman মাননীয় Keka Kalelkar -এর ৩০শে মার্চ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Other Backward Class - এর তালিকায় ১৩ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে এদের জনসংখ্যা পাওয়া যায় ১০৮৪৯১ জন। এই জন সংখ্যা বৃদ্ধির মাপকাঠিতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সম্প্রদায়ের বর্তমান জন সংখ্যার একটি প্রামাণ্য চিত্র পাওয়া যেতে পারে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৭৯ বৎসরে এদের জন সংখ্যা ৫৭৮০২ জনের স্থলে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১০৮৪৯১ জন। এই বর্ধিত হারকে সামনে রেখে হিসাব করলে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩৩ বৎসরে ১০৮৪৯১ জনের স্থলে বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রায় ৪৯১০৪৯ জন। কিন্তু দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে জনসংখ্যা চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের পর মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় এসে বসবাস আরম্ভ করেছে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা ক'রে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সম্প্রদায়ের জন সংখ্যা ৫০ লক্ষ তো নয়ই, বরং ৬৫ লক্ষকেও ছাড়িয়ে যাবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

—0—

গ) বৃত্তি : —

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে কৃষি প্রধান এই পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে এই চাঁই সমাজ মুখ্যত কৃষি কাজকেই বৃত্তি হিসাবে বেছে নিয়েছে। এরা বলদ বাহিত কাঠের লাঙ্গলে জমি চাষ করতে ভালবাসে। এরা গরুকে দেবতা ব'লে মনে করে। তাই যে কোন গরু কিনে আনলেই গৃহিনী নূতন গরুর পা ধুয়ে আঁচল দিয়ে মুছে দেয়। কোন কোন সম্বল পরিবারে বা জোতদারের গৃহে ১০।১৫ টি লাঙ্গলের ব্যবহার ছিল তার পরিচয় মেলে। পারিবারিক লোকেরাই এই সমস্ত লাঙ্গল চষে। তবে এদের ঘরে চাকর রাখার রেওয়াজও আছে। প্রয়োজন বিশেষে অনেকে একাধিক চাকর রাখে। চাকরের বেতন বার্ষিক ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। কৃষি কাজে এরা দৈনিক মজুরীতে দিন মজুর নিয়োগ করে। ভূমিহীন কৃষকেরা ভাগচাষে জমি চাষ করে।

এরা ধান, গম, যব, ভুট্টা, কলাই, ছোলা, অড়হর, পাট, আলু, কপি ইত্যাদি প্রায় সমস্ত কৃষি শস্যই উৎপাদন করে। এরা বারমাসই তরিতরকারীর চাষ করে। উৎপাদিত শস্যাদি গ্রামে, গঞ্জে, হাটে, বাজারে বিক্রয়ও করে। নারীরাও কৃষিকাজে এদের প্রভূত সহায়তা করে। এদের "নারীদের হাটে — মাঠে — ঘাটে খাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হইত, নানা কাজে কর্মে শারীরিক শ্রম করিতে হইত, তাঁহাদের মধ্যে অবগুণ্ঠিত জীবন যাপনের কোন সুযোগ ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না, সে আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল না।"[১৪] বলাবাহুল্য "হাটে বাজারে এই সম্প্রদায়ের মেয়েরা তরিতরকারি বিক্রি করে। কিন্তু এই সমাজের মেয়েদের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তারা কোন বাড়ীতে রাধুনির বা ঝিএর কাজ করে না। মেয়েরা অমন্ডব পরিশ্রমী হয়, কাজেই দারিদ্র্যকে এরা ভয় পায় না বা পরিশ্রমের ভয়ে ভিক্ষাবৃত্তিও গ্রহণ করে না। স্বাধীন ভাবে তারা চলাফেরা করে।" [১৫]

কৃষিকাজ ছাড়া এরা ব্যবসায় - বাণিজ্য, দালালী, ডাক্তারী, ওকালতি, শিক্ষকতা, সরকারী চাকুরী, পশুপালন ইত্যাদিও বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে। প্রাচীন কালে মাছধরাও এদের বৃত্তি ছিল তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তবে বর্তমানে এরা এই বৃত্তিকে গর্হিত কর্ম বলে মনে করে। এরা মাছ ধরে, মাছ প্রতি পালন করে; কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে মাছ বিক্রয় করে না। " কৃষি ভিত্তিক রোজগার ছাড়া এদের মধ্যে অন্য কোন উপায়ে রোজগারের কথা

বা মনোবৃত্তি তেমন দেখা যায় না। চাকুরিয়ার সংখ্যাও খুবই কম, শতকরা পূর্ণ একজনও নয়। এদের মধ্যে যারা চাকুরী করে তারা প্রায়ই গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। কদাচিত দু একজন হাই স্কুলে কাজ করে। এ ছাড়া চাকরির প্রয়োজনে ঘর ছেড়ে বাইরে খুব একটা এরা যেতে চায় না বা বাইরে যাওয়া এদের স্বভাব বিরুদ্ধ বলে মনে হয়।"[১৬] তবে সাম্প্রতিক কালে এদের মাঝে শিক্ষার প্রসার হওয়ার ফলে এবং অর্থনৈতিক কারণে এদের ঘরকুনো ভাবটা কমেছে।

—

ঘ) গাঙ্গেয় সমভূমিতে বসতির কারণ : —

"খুব প্রাচীন কালে লোক বসতি এবং কৃষিকর্ম সাধারণত নদনদী প্রবাহ অনুসরণ করিয়াই বিস্তৃত ছিল। কৃষি কর্মের উপরই জনসাধারণের জীবিকা নির্ভর করিত, এবং সেই কৃষি প্রধান নির্ভরই নদনদী।"[১৭] পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অন্যান্য প্রদেশের যে সমস্ত জেলাতে এই চাঁই সম্প্রদায় বসতি স্থাপন করেছে তার ভৌগোলিক পটভূমি বিচার করলে দেখা যায় এই সমস্ত অঞ্চলই হচ্ছে গাঙ্গেয় সমভূমি। বলা বাহুল্য প্রতি জেলাতেই প্রায় নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে এরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বসবাস করে।" চাঁই জাতিদের বসবাস সাধারণতঃ গঙ্গার দুই পাড় জুড়ে। পশ্চিমে রাজমহল হ'তে পূর্বে নালগোলা ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আরও কিছু অংশ পর্যন্ত এদের বাস। তবে পশ্চিম বঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদেই এরা সংখ্যায় অধিক।"[১৮] মালদহে গঙ্গা নদীর তীরে এদের বসবাসের কারণ হিসাবে বলা চলে, "যখন গৌড় নগরের উপকণ্ঠ বাহিনী গঙ্গানদী উহার পশ্চিমে সরে গিয়ে কয়েকটি চর বা দিয়াড়ার সৃষ্টি করেছিল তখন এই চাঁই জাতি বিহারের ভাগলপুর, মুঙ্গের, পূর্ণিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন এলাকা থেকে উক্ত দিয়াড়া অঞ্চলে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে। এদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকাজ, তাই গঙ্গার ন্যায় সুবৃহৎ নদীর পাশেই এদের অধিক্য। অবশ্য এসব অঞ্চলে এসে বসবাসের কারণ হচ্ছে সে সময়ে ঐ জমিগুলি নিষ্করভাবে ভোগের সুযোগ এবং নদী সন্নিকটস্থ জমির উর্বরতা জনিত ফসলাদির প্রাচুর্যের আশা।"[১৯] মাননীয় G. E. Lambourn এর মালদহ জেলার Gazetteers এ নদীচর বা দিয়াড়া অঞ্চলে চাঁই সম্প্রদায়ের বসবাসের সমর্থন মেলে। "The Chains, who number 43,639, are a caste with Bihari affinities found in large numbers in the diara thanas of the west of the district."[২০]

আদিকালে চাঁই সম্প্রদায়ের মুখ্য উপজীবিকা ছিল কৃষিকার্য ও মাছধরা, এ বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এই সমস্ত উপজীবিকার সুবিধার্থে এরা গাঙ্গেয় সমভূমিতে বসতি স্থাপন করেছে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। নদীর সন্নিকটস্থ অঞ্চলে পলি মৃত্তিকার প্রাচুর্যের কারণে শস্যাদি বিশেষতঃ তরিতরকারী উৎপাদন খুবই ভাল হয়।

এতে সেচেরও সুবিধা আছে। ফসল পরিচর্যা, ধান পাহারা দেওয়া, ফসল তোলা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে সুবিধার কথা চিন্তা করেই এরা কৃষিভূমির নিকটবর্তী অঞ্চলে গৃহ নির্মান ক'রে বসবাস করে। এরা "অবাধ প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত হয়ে নিরুদ্বেগ জীবন জীবিকার তাগিদে প্রকৃতির উর্বর অনুর্বর নদী উপত্যকায় জন্ম জন্মান্তর ধরে বংশ পরম্পরায় বসবাস ক'রে হাজার হাজার মানুষের অন্নের সংস্থান ক'রে চলেছে।"[২১] নদনদীর সাথে মিতালি এদের বহু প্রাচীন। চলমান নদীপ্রবাহের মতই এদের জীবন সঞ্চারমান, কর্মচঞ্চল। "যে জমিতে নিরন্তর হাল চালিয়ে সার ছিটিয়ে এরা উর্বর করে তোলে তারই শ্যামলতা এদের প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হয়ে যায়, এদের ঐকান্তিক শ্রম ও যত্নে মাঠে মাঠে যে সবুজের সমারোহ ঘটে তারি লাবণ্য এদের প্রকৃতিতে এনে দেয় একটা অপরূপ স্নিগ্ধতা, আর নিরন্তর নদীজলের হাওয়ায় হাওয়ায় এদের প্রাণে মৃদু বেগের সঞ্চার দেখা দেয় সর্বক্ষণ।"[২২] এরা যেমন নিষ্ঠুর, নির্মম, তেমন কষ্টসহিষ্ণু, তেমনি প্রকৃতির সুকোমল স্নেহ স্পর্শে এদের আচার আচরণে, কথা বার্তায় অনেক সময় নেমে আসে সুকোমল নম্রতা।

---

৬) আর্থিক অবস্থা :—

"সমাজ সংস্থানের বস্তু - ভিত্তি হইতেছে ধন। এই ধন যে শুধু ব্যক্তির পক্ষে অপরিহার্য তাহা নয়, গোষ্ঠী ও সমাজের পক্ষেও ইহা সমভাবে অপরিহার্য। ধন ছাড়া কোনও দেশের কোনও বিশেষ কালের সমাজের ব্যবসা-বাণিজ্য কল্পনাই করিতে পারা যায় না; ধন ছাড়া সমাজের রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হইতে পারে না; শুধু রাষ্ট্রের কথাই বা বলি কেন, ধর্ম, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি — কিছুই এই ধন ছাড়া চলিতে পারে না।

নানা বর্ণ, নানা জাতি এবং নানা শ্রেণীর অপণ্ডিত ও অলিখিত জনসমষ্টি লইয়া প্রাচীন বাংলার যে সমাজ, তাহার পরিকল্পনা এবং সংস্থানে যে ধন প্রয়োজন হইত, তাহা আসিত কোথা হইতে ? ..... ধনোৎপাদনের উপায় কী কী ? প্রচীন বাংলায় দেখিতেছি, ধনোৎপাদনের তিন উপায় : কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য। ইহাদের মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্যই প্রধান; আজ পর্যন্তও বাংলাদেশে কৃষিই প্রধান ধনসম্বল, তার পরেই শিল্প।"[২৩]

চাঁই সম্প্রদায়ের মুখ্য উপজীবিকা তো এই কৃষিই। দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধিতে এরা অহোরাত্রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, ঝড়-বৃষ্টি, খরতাপের মধ্য দিয়ে নিজেদের সমব্যস্ত রেখেছে। কিন্তু এদের আর্থিক অবস্থা কি ? কৃষি নির্ভর চাঁই সমাজের আর্থিক অবস্থা খুব সম্বল নয়। কারণ হিসাবে বলা চলে এদের মধ্যে শিক্ষার আলোক খুব বেশী অনুপ্রবেশ করেনি। মোটা ভাত কাপড়ে এরা সন্তুষ্টছিল ব'লে অতীতে শিক্ষার প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না। তাই অনুন্নত প্রথায় কৃষিকার্য, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় সময়ই এরা বিপর্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে কৃষিকর্মে আত্ম নিয়োগের প্রবণতা দেখা দেয়। এই সময় "শিল্প বাণিজ্য ধ্বংসের ফলে সাধারণ শ্রেণীর অনেক লোকেই জীবিকা অর্জনের জন্য কৃষিকার্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। এইভাবে বেশী লোকের এই জমি চাষের কার্যের অগ্রসর হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হইল কৃষির আয়ের হ্রাস। ইংরেজ কোম্পানিও সুযোগ পাইয়া রাজস্বের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে লাগিল।"[২৪] ফলে কৃষকের আর্থিক অবস্থার অবনতি দেখা দিল। স্বাভাবিক ভাবে চাঁই সম্প্রদায়ও পড়েছে এই দুরবস্থার কবলে। অর্থনৈতিক অবনমনের ফলে অন্যান্য সমাজের মত চাঁই সমাজেও একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরেছে। যৌথ পরিবারের ভাঙনের কারণে তাদের অর্জিত ভূ-সম্পত্তি হয়েছে বিখণ্ডিত। তাই,

"ভূমি সম্পত্তি যত বেশী পরিমাণে টুকরা টুকরা ভাগ হইল, প্রতি পরিবারের জীবিকা নির্বাহের পক্ষে তাহা ততই অপ্রচুর হইল।"[২৫] এককালে যখন জমিদারী প্রথা বর্তমান ছিল তখন, "মাটিতে যাদের ঠেকেনা চরণ, মাটির মালিক তাঁহারাই হন"।[২৬] আর তাঁদের নির্মম শোষণে বাংলার কৃষককুলের অবস্থা হয়েছিল চরম। ভূমি থেকেও ভূমি ভোগ করার অধিকার তাদের ছিল না। জমিদারের ইচ্ছামত খেয়াল খুশীর উপর তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হ'ত। বর্তমান কালে রাজনৈতিক প্রভাব পড়েছে কৃষি ও কৃষকের উপর। জমিদারী প্রথার বিলোপ ঘটেছে; জোতদারও বিলুপ্তির পথে। কিন্তু তবু জমিদারী প্রথা নির্মূল হয়েছে কি? জমিদার নেই, কিন্তু হৃদ্যবেশী মহাজন আছে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষক এখনও মহাজনদের হাতের ক্রীড়নক। স্বল্প ভূমির মালিক, কৃষক এই চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষ বর্তমানে তার জীবন ধারণের মৌল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহে অক্ষম। স্বাভাবিক ভাবেই এদের জীবন ও জীবিকা সচ্ছল নয়। তাই পুরুষের সঙ্গে নারী এমনকি স্বল্প বয়স্ক সন্তান সন্ততিও অহোরাত্র কায়িক পরিশ্রম করে জীবন ধারনের তাগিদে।" অশিক্ষিত, গরিব, পরিশ্রমী, সংস্কারাচ্ছন্ন এই সম্প্রদায় অযথা হানাহানি ক'রে শক্তিক্ষয় করে থাকে।"[২৭] এদের আর্থিক অনটনই এই মানসিকতার জন্য দায়ী।

—০—

চ) শিক্ষা :—

পরিবর্তনশীল জগৎ । এই পরিবর্তনের প্রবাহ বিচ্ছুরিত হচ্ছে অহরহ, যেথা সেথা । সমাজ তার জন্মলগ্ন থেকেই প্রগতির হাত ধ'রে এগিয়ে চলেছে । এই প্রগতিকে পাথেয় জুগিয়েছে শিক্ষা ।" যে কোন জাতি বা সমাজের সংস্কৃতি ও সভ্যতা শিক্ষা ব্যবস্থারই ফল । একটা জাতি বা দেশের পরিচয় তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে । শিক্ষার মধ্য দিয়েই যেমন কোন ব্যক্তির আত্ম বিকাশ ঘটে তেমনি শিক্ষার মধ্য দিয়েই একটা সমাজ, জাতি তথা দেশের সার্বিক বিকাশ ঘ'টে থাকে । বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত পৃথিবীতে যে কি শিক্ষাকে এতখানি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তার স্বরূপ প্রত্যেকটি সমাজ সচেতন মানুষের চোখে ধরা পড়েছে ।কারণ শিক্ষার সংগে সমাজের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট । শিক্ষা সমাজ জীবনের মেরুদন্ড ।" [২৮] অথচ এই শিক্ষা থেকে দীর্ঘকাল দূরে সরেছিল এই চাঁই সম্প্রদায় ।" এদের মধ্যে শিক্ষার প্রভাব খুবই কম । ..... চাঁই জাতি ইদানিং ধীরে ধীরে উন্নত হতে থাকলেও এদের মধ্যে শিক্ষার হার মোটেই সন্তোষজনক নয় ।" [২৯] " They are both social and educationally backward and marked and remarked as the most backward class by the backward class commission headed by Kaka Kalelkar, Chairman in 1955." [৩০] সত্যই তো "অনগ্রসর শ্রেণীদের মধ্যে উক্ত সম্প্রদায় অন্যতম । কাকা সাহেব কালেলকার কমিশন প্রদত্ত প্রতিবেদনে চাঁই সম্প্রদায় 'শিক্ষায় সর্বাধিক পশ্চাদপদ' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে । বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে রেখেছে ।" [৩১] "কিছুই নাই এদের এলাকায় । খবর নিন, দু'দশ বছর আগে পর্যন্ত এদের বসতির কাছাকাছি একটা প্রাইমারি স্কুলের চেহারা দেখা যেত না । এখনও দুটো একটা যা হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগন্য । নাই এদের অনেক কিছুই, চাষবাস নিয়েই যখন জীবন যাত্রা কাজেই এরা শহর থেকে দূরে দূরেই বসতি স্থাপন করে । শহর জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের ছিটে ফোঁটাও এদের ভাগ্যে জোটে না । না রাস্তাঘাট, না তেমন পানীয় জলের ব্যবস্থা । এরা সবদিক দিয়ে অনগ্রসর, তেমনি সকল প্রকারে বঞ্চিত ।"[৩২] কিন্তু তবুও সংগ্রামী, কর্মদোসর চাঁই সম্প্রদায় আজ পথে থমকে থাকেনি । সভ্য জীবনের যেটুকু আলোর নিশানা এদের মাঝে এসেছে তারই পথ ধরে প্রগতির সোপানে পদার্পণ করেছে এরা । চাঁই সমাজ শিক্ষার আলোক

স্পর্শে বেশ উৎফুল্ল । স্বাধীনোত্তর ভারতে এদের ঘরে ঘরে আজ এসেছে শিক্ষার জোয়ার ।

পশ্চিমবঙ্গের হালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলার চাঁই সমাজ আজ শিক্ষায় দীক্ষায় বেশ উন্নত । মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রী আজ অনেকের হাতে । এরা আজ উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার এবং সরকারী - বেসরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে নানা বৃত্তি গ্রহণ ক'রে শিক্ষিত সমাজের পার্শ্বে দাঁড়াতে শিখেছে । এদিক দিয়ে এ সমাজের নারীরাও আর পশ্চাদপদ নয় । এদের অনেকেই সাম্প্রতিক কালে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করতে সক্ষম হয়েছে । উদাহরণ হিসাবে পরিশিষ্টে কিছু নিদর্শন উল্লেখ করা হ'ল । — নারীরা পুরুষদের মত চাকুরীতে অংশ গ্রহণ করছে । এরা স্কুল কলেজে ও ক্লাবে নৃত্য গীত, অভিনয় ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ ক'রে বেশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করছে । গার্হস্থ বিজ্ঞানেও এখন এই সম্প্রদায় বেশ উন্নত ।

—০—

ছ) সামাজিক সংগঠন:—

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের আবেষ্টনীর মধ্যে তার জন্ম, তার লালনপালন, সুখআনন্দ, মনের বিকাশ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজের বিভিন্ন ধাপ পার হ'তে হয় এক একটি মানুষকে। তবে এই সমাজেরও পরিবর্তন আছে। শিল্প, সভ্যতা, সংস্কৃতির ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থারও পরিবর্তন সাধিত হয়। আধুনিক সমাজ বলতে বুঝায় সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি। গৃহ, বিদ্যালয়, ক্লাব, লাইব্রেরী, পূজা - উৎসব, রাজনৈতিক দল সবাই প্রভাব বিস্তার করে এই সমাজের উপর। মানুষের হৃদয় মন, চিন্তাধারা বিকশিত হয় এই সমাজের মধ্যেই।

চাঁই সম্প্রদায়ের সামাজিক সংগঠন অতি প্রাচীন। তবে এর রূপরেখা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মোড়ল - মাতব্বর, সমাজপতি - বাইশী প্রথার মধ্যেই এর পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ। এই সম্প্রদায় নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং উচ্চ জাতি প্রতিপন্ন করার মানসিকতায় একাধিক সম্মেলন করেছে, কিন্তু তা কোনবারই ফলপ্রসূ হয়নি। বিগত ১৩৪৭ সালে মালদহ জেলার খাসমহল ঝাউবনাতে চাঁই সম্প্রদায়ের এক বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছিল " প্রায় ১৫ হাজার প্রতিনিধির সমাবেশ। সভাপতি শ্রীরাধিকা নাথ দাস বি.এ. মহোদয়। সম্পাদক শ্রী হীরালাল মণ্ডল, খাসমহল, ঝাউবনা - মালদহ। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী প্রভৃতি জেলা থেকে প্রতিনিধি তো যোগদান করেছেনই, উপরন্ত বিহারের সাঁওতাল পরগণা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলা থেকেও বহু সংখ্যক প্রতিনিধি উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেছেন। ..... ১৩৪৭ সালের পূর্বে ১৩৩৭ সালেও তাঁরা চাঁই বৈশ্য সম্মেলন নামে সামাজিক সম্মেলন আর একবার করেছিলেন। উদ্দেশ্য চাঁই সমাজের মধ্যে শ্রেণীভেদ তুলে দেওয়া। তারপর চাঁই সমাজ উচ্চ শ্রেণীভুক্ত এটাও প্রতীয়মান করা।"[৩৩]

এরপর চাঁই সম্প্রদায়কে "চন্দ্রক্ষত্রীয় প্রমাণ করতে এবং সেই হিসাবে নিজেদের পরিচিতি প্রচার করতে বিগত "১৩৫৭ সালে মালদহের অনুকরণে দেবী পুরে (মুর্শিদাবাদ) শ্রী লাল চাঁদ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং শ্রী নরেন্দ্র নাথ সরকার মহাশয়ের সম্পাদনায় ১১০ । ১১৫ গ্রামের মণ্ডল - মাতব্বরগণকে সমবেত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ... উল্লেখ যোগ্য যে উক্ত সভায় শ্রীকালাচাঁদ সরকার মহাশয়ের 'স্বজাতির প্রতি আবেদন' নামীয় হ্যান্ডবিল, চারণ কবি শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চৌধুরীর বক্তৃতা এবং সম্প্রদায়ের আচরণ ইত্যাদি "ক্ষত্রিয়"

অর্থাৎ "চন্দ্র ক্ষত্রিয়" মতবাদ প্রচারে বিশেষ সাহায্য করে। পরশুরামের ২১ বার নিঃক্ষত্রিয় করণ, সভায় আদিসুরের উপাখ্যান, বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথা, জাতিমালা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই আলোচনা হয়।"[৩৪]

সামাজিক 'বাইশী' বিচার বা সম্মেলন প্রথা তিরোহিত হওয়ার পর যে সমস্ত জেলা বা প্রাদেশিক সম্মেলন বা সংগঠন ইতিপূর্বে হয়েছে তার সমস্তই জাতিকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার মানসেই।" বর্তমানে এদের মধ্যে কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজ উন্নয়নের কর্মসূচী নিয়েছেন। এরা বর্তমানে শিক্ষায় দীক্ষায় সামাজিক চেতনায় সব চাইতে পশ্চাৎপদ অনগ্রসর। অথচ এরা ভারতের সংবিধানে না তপশীল জাতি, না উপজাতি। এ এক বিচিত্র ব্যাপার। ত্রিশঙ্কুর মত এরা শূন্যে অবস্থিত।"[৩৫] তাই এই সম্প্রদায় তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সার্বিক মান উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে। এতদুদ্দেশ্যে জেলায় জেলায় বিভিন্ন সংগঠনিক তৎপরতা দেখা দেয়। এই তৎপরতার পথ প্রদর্শক হিসাবে মুর্শিদাবাদ জেলার ভূমিকাই অগ্রণী। বাংলা ১৩৭০ সালে "মুর্শিদাবাদ জেলা চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতি"র গোড়া পত্তন হয়। এই সময়ই মুর্শিদাবাদ জেলায় থানা ভিত্তিক মোট ১৪টি থানা কমিটি গঠন করা হয়। এই থানা কমিটি গুলির বিভিন্ন সময়ে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার পরিচিতি নিম্নরূপ।:—

ক্রমিক নং	তারিখ	থানা সম্মেলনের নাম	সদস্য সংখ্যা
১	বাং ১৪।৭।৭০	লালগোলা থানা সম্মেলন	১১
২	১৫।৭।৭০	ভগবানগোলা	১২
৩	১৬।৭।৭০	রঘুনাথগঞ্জ	১২
৪	১৭।৭।৭০	জিয়াগঞ্জ	১২
৫	২৩।৭।৭০	রাণীনগর	১২
৬	২৯।৭।৭০	জলঙ্গী	১২
৭	১৫।৯।৭০	মুর্শিদাবাদ	৯
৮	১৫।৯।৭০	বহরমপুর	১২
৯	১৫।৯।৭০	কান্দী	৯
১০	১৬।৯।৭০	হরিহরপাড়া	৯
১১	ইং ২২।৫।৬৪	সুতী	১২
১২	২৬।১২।৬৪	সমসের গঞ্জ	১১
১৩	২৬।১২।৬৪	ফরাক্কা	১১
১৪	১০।১।৬৫	সাগরদিঘি	১২

সংগঠিত মোট ১৪টি থানার সদস্য সংখ্যা ১৫৬ জন। এদের নিয়েই তখন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ গঠিত হয়। এই জেলা পরিষদের সাংগঠনিক সম্মেলন ইংরেজী ২৩।১।৬৫ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবান গোলার পাটামারী গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২০।৩।৬৫ এবং ২১।৩।৬৫ তারিখ দুইদিন ব্যাপি রঘুনাথ গঞ্জের রাইলের উপর গ্রামে এর পরবর্তী বৃহদাকার জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৮ সালে জনতা সরকারের রাজত্বকালে চাঁই সমাজকে অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত করার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে বিদেশ মন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী মহোদয়কে এবং লোকসভার অনুন্নত শ্রেণীর বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে যথোপযুক্ত আবেদন জানানো হয়।

ভারত সরকারের স্বীকৃত শিক্ষায় অনুন্নত (Educationally backward class) এবং ১৯৫৫ সালের (Backward Class Commission - এর Chairman Keka Kalelkar - সাহেবের ১০৫টি Backward Class জাতির তালিকায় most backward (Sl.No.12) ব'লে চিহ্নিত চাঁই জাতির শিক্ষিত যুব সমাজ আজ তাদের উন্নয়নের পথ অন্বেষনে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। কেবল মুর্শিদাবাদ, মালদহ জেলা নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে এদের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক ক্লাব বা সমিতি সংগঠিত হয়েছে। সংগঠিত হয়েছে বিভিন্ন জেলা চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতি। সম্প্রতি ১৯৮০ সালে "পশ্চিমবঙ্গ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতি" নামে একটি প্রাদেশিক সংগঠন আত্ম প্রকাশ করেছে। ১৯৮০ সালের ১২ই মে কলিকাতায় শ্রী পীতাম্বর মন্ডল এম.কম মহাশয়ের প্রচেষ্টায় এর ক একটি ম্যানেজিং কমিটি অ্যাডহক ভিত্তিতে গঠিত হয়। নদীয়া জেলার শ্রী বিজয় কুমার মন্ডল এম.এ, বি.টি.- প্রধান শিক্ষক :, এবং মুর্শিদাবাদ জেলার শ্রী বিষ্ণুপদ মন্ডল উক্ত ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। সহ সভাপতি নির্বাচিত হন মালদহ জেলার শ্রী নলিনী রঞ্জন সরকার এম.এ, বি.টি ; ~~কলিকাতার~~ কলিকাতার শ্রী পীতাম্বর মন্ডল এম.কম, এবং মুর্শিদাবাদের শ্রী পঙ্কজ কুমার মন্ডল বি.এ. মহাশয়। সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয় মুর্শিদাবাদের শ্রী হরিপদ সরকার বি.এ. মহাশয়কে এবং রহড়া - ২৪ পরগণার শ্রী ধরণী ধর মন্ডল বি.এ. মহাশয়কে। বিভিন্ন জেলার মোট ৩৭ জন সদস্য এই ম্যানেজিং কমিটিতে স্থান পেয়েছিলেন। এই সময় থেকেই প্রাদেশিক স্তরে চাঁই সম্প্রদায়ের সংগঠনিক অভিযানের আরম্ভ। ক্রমে জেলা, থানা এবং অঞ্চল কমিটি গঠনের মাধ্যমে এদের এই সংগঠন একটি সুসংহত রূপ ধারণ করে।

পশ্চিমবঙ্গ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির " প্রথম প্রাদেশিক সাধারণ সম্মেলন যাহা ২১শে মার্চ ১৯৮১ অনুষ্ঠিত হয় জগদীপুর শহর সংলগ্ন নালধাঁর দিয়ার গ্রামে। এই মহা সম্মেলন সম্মেলন নানা দিক হতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। এই সম্মেলনেই সমিতির মুখপত্র চাঁই সমাজের সমীক্ষামূলক পত্রিকা "পরিচয়" প্রথম প্রকাশিত হয়। সমিতির বর্তমান সংবিধান গৃহীত হয়। এই সমাজের নানা কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য পণ প্রথার মত কুপ্রথা দূরীকরণের জন্য নানা প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই সংগে অনগ্রসর শ্রেণী হিসাবে শিক্ষায় সরকারী অনুদান ও চাকুরী ক্ষেত্রে আনুপাতিক সংরক্ষণের দাবীও গৃহীত হয়। এক কথায় নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে হতাশা জর্জর অবহেলিত চাঁই সমাজের মধ্যে নানা আশার আলো প্রজ্বলিত হয় এই মহা সম্মেলনে যার ইতিহাস আলাদা ভাবে লেখার উপযোগিতা বহন করে। এই সম্মেলনে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারা পঞ্চায়েত ও সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সমিতির পক্ষ থেকে প্রদত্ত স্মারক লিপি সব দিক হতে নূতনত্বের দাবী রাখে।"৩৬

সমিতির দ্বিতীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয় ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে মালদহের কালিয়াচক থানার সাহাবাজ পুর গ্রামে। আর তৃতীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার পীরতলা গ্রামে ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে। এই সম্মেলনে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ডক্টর শ্রী সুনীল কুমার ওঝা এম-এ, পি.এইচ-ডি মহাশয়। প্রাদেশিক সম্মেলনে চাঁই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। বিভিন্ন প্রতিনিধির আলোচনা ও বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই জাতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। এতদ্ব্যতিত চাঁই সম্প্রদায়ের ভাষা, গান, গীত, হোলিগান, আবৃত্তি ইত্যাদি পরিবেশনের মাধ্যমে শ্রোতৃমণ্ডলীকে এক নূতন জগতের সন্ধান দান করেন।

"খুব দেরীতে হলেও পশ্চিমবঙ্গ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতি এই সমাজের মধ্যে শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা সামাজিক উন্নতির জন্য ঐক্য, মৈত্রী, সহযোগিতা বিস্তারের জন্য চিন্তা ভাবনা করছে। এটা সত্যি খুব প্রশংসা ও গৌরবের। তার ফলে বাইরের জ্ঞানী ও গুণীজনের দৃষ্টি আকৃষ্টিত্ত হয়েছে – যারা এই সমাজ নিয়ে ইতিমধ্যে নানা প্রকার তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা ও চিন্তা ভাবনা আরম্ভ করেছেন। এই সমিতির বর্তমানে এটাই সব চাইতে বড় লাভ। উপরন্ত সমিতি

বিজ্ঞান ভিত্তিক দাবী দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গণ আন্দোলন আরম্ভ করেছেন — যে আন্দোলন অন্ততঃ কয়েক দশক আগেই আরম্ভ হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাই দেরীতে হলেও সমিতির প্রচেষ্টায় সভা সম্মেলন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে আজ চাঁই সমাজ সঠিক পদক্ষেপই নিচ্ছেন — হাজার বছরের ঘুমে থাকা সমাজ আজ জাগছে।"[৩৭]

—০—

– পাদটীকা –

১) শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার, এম-এ, পি-এইচ-ডি / বাংলা দেশের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড ; আধুনিক যুগ / শ্রী সুরজিৎ চন্দ্র দাস / প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৮ / পৃষ্ঠা ৩৫৭

২) মানিক দত্ত / চণ্ডীমঙ্গল / (মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল / ডঃ সুনীল কুমার ওঝা সম্পাদিত) / উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় , ১৩৮৪ / পৃষ্ঠা ২০০

৩) শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার , এম-এ, পি-এইচ-ডি / বাংলা দেশের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড ; আধুনিক যুগ / শ্রী সুরজিৎ চন্দ্র দাস / প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৮ / পৃষ্ঠা ৩৫৫ এবং ৩৫৭ ।

৪) G.E. Lambourn, Esq. B.A. / Bengal District Gazetteers, Malda / Calcutta, 1918 / Page = 28.

৫) A. Mitra / Census 1951 / West Bengal / The Tribes and Castes of West Bengal / Land and Land Revenue Department / 1953 / Page = 77.

৬) নীহার রঞ্জন রায় / বাঙালীর ইতিহাস , আদি পর্ব (সংশোধিত সংস্করণ) / শ্রী জ্যোৎস্না সিংহ রায় / পুনর্মুদ্রন, অগ্রহায়ণ –১৩৮২ / পৃষ্ঠা ১৯২ এবং ১৯৩ ।

৭) বিষ্ণুপদ মন্ডল / মুর্শিদাবাদ জেলা চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির সভাপতির প্রতিবেদন/ প্রথম বার্ষিক সম্মেলন, ১৫ই চৈত্র , ১৩৮৭ / পৃষ্ঠা ৫ ।

৮) শ্রী তুলসী চরণ মন্ডল/ সম্পাদকীয় / পরিচয় / পশ্চিমবঙ্গ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির মুখপত্র / ফাল্গুন, ১৩৮৮ ।

৯) পঙ্কজ কুমার মন্ডল / চাঁই সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা ও শিক্ষায় অনগ্রসরতা / পরিচয় / পশ্চিমবঙ্গ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির মুখপত্র / ফাল্গুন, ১৩৮৮ / পৃষ্ঠা ১২ ।

১০) শ্রী তুলসী চরণ মন্ডল / একটু খানি ভাবুন / পরিচয় / পশ্চিমবঙ্গ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির মুখপত্র / ৫ম সংখ্যা, ১৯৮৩ / পৃষ্ঠা ২২ ।

১১) ঐ / পৃষ্ঠা ২২ ।

১২) W.W. Hunter / A Statistical Account of Bengal / D.K. Publishing House, Delhi-110035 / First Re-printed in India 1974 / Statistical Account of Maldah / Vol - VII / Page = 44.

১৩) List of other Backward Class as recommended by the Backward Classes Commission, headed by Keka Kalelkar, Chairman/XXXXX SL. No. 12 / মুর্শিদাবাদ জেলা চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতি, সাংগঠনিক কার্যধারা বিবরণী / ১৫ই চৈত্র, ১৩৮৭ / পৃষ্ঠা - ৩০।৩১ ।

১৩) G.E. Lambourn, Esq. B.A./ Bengal District Gazetteers, Malda / Calcutta, 1918/ Page = 28

১৪) নীহার রঞ্জন রায় / বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব (সংশোধিত সংস্করণ) / শ্রী জ্যোৎস্না সিংহ রায় / পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮২ / পৃষ্ঠা ২৯৩ ।

১৫) ডঃ দীপ্তিময় সরকার / চাঁই সম্প্রদায় : শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি / দর্পক / ২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৮২ / সম্পাদক – দেবকুমার বসু ও ডঃ রবি মিত্র / পৃষ্ঠা ৮ ।

১৬) ডঃ সুনীল কুমার ওঝা / মালদহের একটি জাতি – চাঁই / ত্রিবৃত্ত / শারদীয়া (উত্তরবঙ্গ) সংখ্যা / ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ / সম্পাদক – রণজিৎ দেব / কুচবিহার / পৃষ্ঠা ৪৫ ।

১৭) নীহার রঞ্জন রায় / বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব / শ্রী জ্যোৎস্না সিংহ রায় / পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ - ১৩৮২ / পৃষ্ঠা ১২০ ।

১৮) ডঃ সুনীল কুমার ওঝা / মালদহের একটি জাতি – চাঁই / ত্রিবৃত্ত / শারদীয়া (উত্তরবঙ্গ) সংখ্যা / ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ / সম্পাদক – রণজিৎ দেব / কুচবিহার / পৃষ্ঠা ৪১ ।

১৯) ঐ / পৃষ্ঠা ৪১ ।

২০) G.E. Lambourn, Esq. B.A./ Bengal District Gazetteers, Malda / Calcutta, 1918/ Page = 28

২১) শ্রী রামপ্রবেশ মণ্ডল / চাঁই সমাজের জীবিকার রূপরেখা এবং তার উন্নতির উপায় / পরিচয় / পশ্চিমবঙ্গ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির মুখপত্র / মার্চ, ১৯৮২ / পৃষ্ঠা – ট ।

২২) সত্যেন্দ্র নাথ বড়াল / চাঁই সমাজ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা / পরিচয় / পশ্চিমবঙ্গ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির মুখপত্র / ৩য় সংখ্যা – ১৯৮২ / পৃষ্ঠা ৩৩ ।

২৩) নীহার রঞ্জন রায় / বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব / শ্রী জ্যোৎস্না সিংহ রায় / পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮২ / পৃষ্ঠা ৭৪ ।

২৪) শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার, এম-এ, পি-এইচ -ডি / বাংলা দেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড ; আধুনিক যুগ / শ্রী সুরজিৎ চন্দ্র দাস / প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৮ / পৃষ্ঠা ৩৯১ ।

২৫) ঐ / পৃষ্ঠা ২৭৫ ।

২৬) নজরুল ইসলাম / ফরিয়াদ / কলিকাতা / শ্রী গোপাল দাস মজুমদার / ডি.এম.লাইব্রেরী / পঞ্চম সংস্করণ – ১৩৮৪ / পৃষ্ঠা ১১ ।

২৭) ডঃ দীপ্তিময় সরকার / চাঁই সম্প্রদায় : শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি / দর্পক / ২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৮২/ সম্পাদক — দেব কুমার বসু ও ডঃ রবি মিত্র/ পৃষ্ঠা ৮।

২৮) শ্রীমতী চন্দনা রাণী মন্ডল / চাঁই সমাজ উন্নয়নে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা / পরিচয় / পশ্চিমবঙ্গ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির মুখপত্র, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৮২ / পৃষ্ঠা ৮।

২৯) ডঃ সুনীল কুমার ওঝা / মানবদেহের একটি জাতি — চাঁই / ত্রিবৃত্ত / পারদীয়া (উত্তরবঙ্গ) সংখ্যা / ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮/সম্পাদক — রণজিৎ দেব/কুচবিহার / পৃষ্ঠা ৪৫।

৩০) Haripada Sarkar, Secretary, W.B. Chain Samaj Unnayan Samity / মুর্শিদাবাদ জেলা চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতি, সাংগঠনিক কার্যাধারা বিবরণী, ১৫ই চৈত্র ১৩৮৭ / পৃষ্ঠা ৪৩।

৩১) পঙ্কজ কুমার মন্ডল / চাঁই সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা ও শিক্ষায় অনগ্রসরতা / পরিচয় / প.ব. চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির মুখপত্র, ২য় সংখ্যা, ১৯৮২ / পৃষ্ঠা ১২।

৩২) সত্যেন্দ্র নাথ বড়াল / চাঁই সমাজ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা / পরিচয় / প.ব. চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির মুখপত্র, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮২ / পৃষ্ঠা চৌত্রিশ।

৩৩) বিষ্ণুপদ মন্ডল / মুর্শিদাবাদ জেলা চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির সভাপতির প্রতিবেদন, / প্রথম বার্ষিক সম্মেলন, ১৯৮১ / পৃষ্ঠা ৪ - ৫।

৩৪) ঐ / পৃষ্ঠা ৫ - ৬।

৩৫) ডঃ রাধানাথ সরকার / চাঁই ধানুক সম্প্রদায়ের কথা / পরিচয় / প.ব. চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির মুখপত্র, ৫ম সংখ্যা — ১৯৮৩ / পৃষ্ঠা ২০।

৩৬) শ্রী তুলসী চরণ মন্ডল / সম্পাদকীয় / পরিচয় প.ব. চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির মুখপত্র / দ্বিতীয় বার্ষিক প্রাদেশিক সম্মেলন, ১৯৮২।

৩৭) আনন্দ পুরুষ / আত্ম বিস্মৃত সমাজ জাগছে / পরিচয় / প.ব. চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির মুখপত্র / ৪র্থ সংখ্যা ১৯৮৩ / পৃষ্ঠা ১৭।

—